দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

৪ জুলাই - ২০১১, ১৯ আষাঢ় - ১৪১৮
শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা।। ৬৩ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা

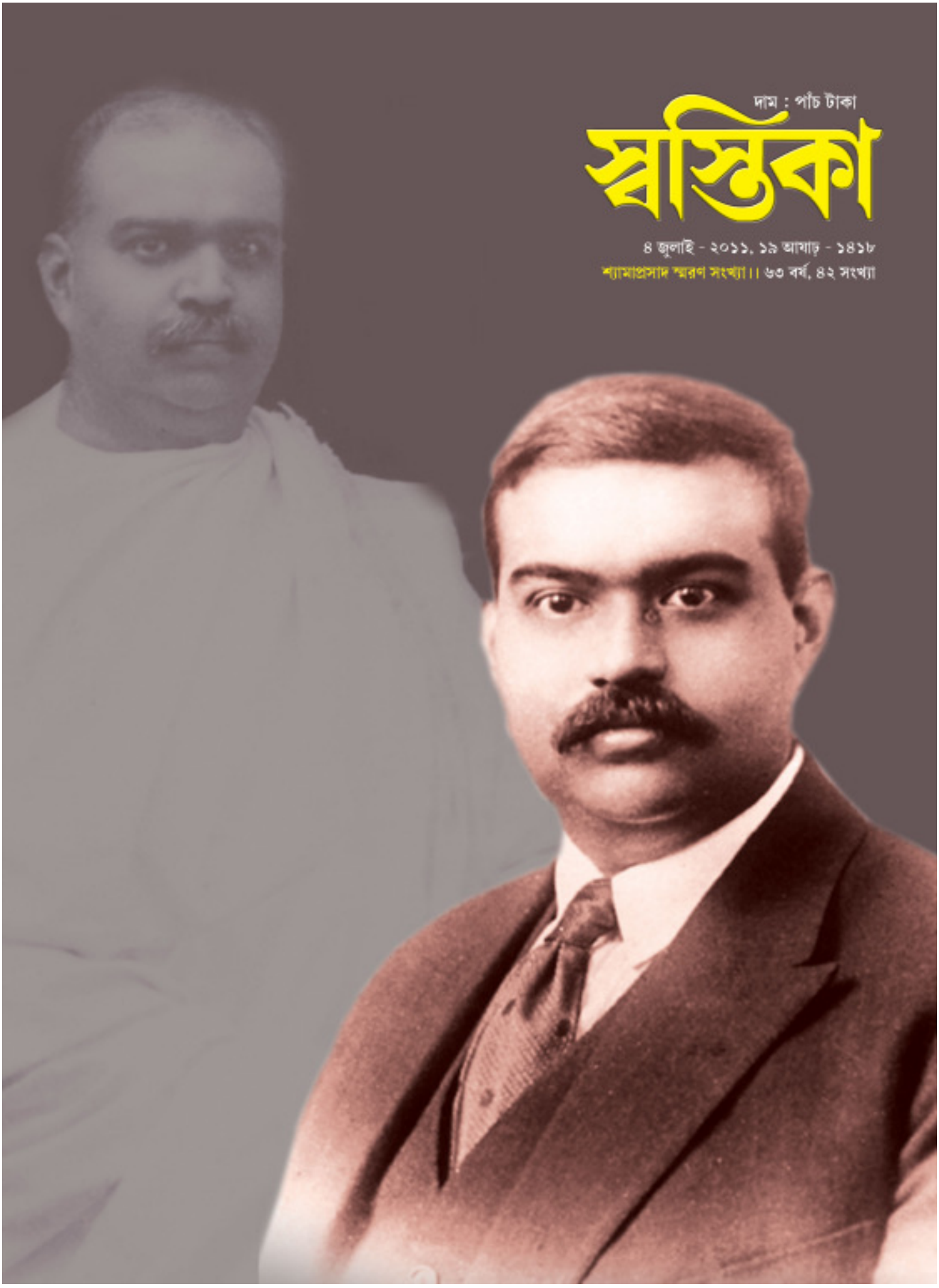

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা আদৌ স্বপ্ন-বিলাস নয় ❑

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ❑

স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতির রূপকার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ❑

শ্যামলেশ দাস ❑

শিক্ষাব্রতী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ❑ ডঃ দিবাকর কুণ্ডু ❑

জাগ্রত ভারতে ক্ষীয়মাণ হিন্দু বাঙ্গালী ও শ্যামাপ্রসাদ ❑

ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ❑ ভাস্কর চৌধুরী ❑

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ও সাধনা কি ব্যর্থ হবে? ❑

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❑

কলকাতায় সাড়ম্বরে পালিত হলো শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবস ❑

বাসুদেব পাল ❑

শ্যামাপ্রসাদ চর্চা : লিখিত ও সম্পর্কিত ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১৯ আষাঢ়, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৪ জুলাই - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মীর ওয়াইজ ফারুক ও আই সি-তে?

বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ সরকারের কাশ্মীর নীতির দুর্বলতা, অহেতুক তোষণের চূড়ান্ত প্রবণতা, সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সর্বদলীয় প্রস্তাবের বিপরীত আচরণ আবারও একবার জনসমক্ষে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী পাক-পন্থী 'হুরিয়ত কনফারেন্স'-এর নেতা মীর ওয়াইজ ওমর ফারুককে বিশ্বব্যাপী মুসলমান দেশগুলির সংগঠন — অর্গানাইজেশন অফ্ ইসলামিক কান্ট্রিজ (ও আই সি)-র সম্মেলনে যোগ দিতে অনুমতি দিয়াছে কিংবা অনুমতি প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক-চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিশেষজ্ঞদের মতামত বিস্তারিত আলোচনা হইতেছে। প্রসঙ্গত দুইটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম, পি ভি নরসিমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল—কাশ্মীরের একমাত্র সমস্যা হইল পাকিস্তানের জবরদখলকৃত কাশ্মীর-কে ভারতে ফিরাইয়া আনা। ইউ পি এ সরকারের হাবভাবে কাজে-কর্মে দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত প্রস্তাব বিস্মৃত হইয়াছে। অথবা, জানিয়া-বুঝিয়া তাহা লইয়া কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করিতে প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়ত, হুরিয়ত কনফারেন্স-এর দুই গোষ্ঠীর তাবৎ নেতৃবৃন্দ এন ডি এ জমানায় তাহাদের পাকিস্তানী মুরুব্বীদের সহিত শলা-পরামর্শ করিতে পাকিস্তানে যাইবে বলিয়া মনস্থির করিয়া ভারত সরকারের অনুমতি চাহিয়াছিল। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের সেই অপপ্রয়াসের অপমৃত্যু ঘটে। এক্ষণে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত 'ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট'-এ সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল, কোনও করদ-রাজ্য স্বাধীন থাকিতে পারিবে না। তাহাদের ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতেই হইবে। সেই আইন অনুসারেই অন্যান্য দেশীয় করদরাজ্যগুলির মতোই জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং একই 'ভারতভুক্তি আইনে' স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরেও ৩৭০ ধারা নামে 'চিরকালীন ও অস্থায়ী' বিশেষাধিকার প্রদান করিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের অবশিষ্ট ভারতের সহিত বিভেদের প্রাচীর খাড়া করাইয়া রাখিলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানের কারণে 'দুই নিশান', 'দুই প্রধান' অবলুপ্ত হইলেও দুই বিধান (দুই ধরনের আইন) অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে। সম্প্রতি বি এস এফ-এর এক উচ্চপদস্থ অফিসার প্রকাশ্যে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে স্বীকার করিয়াছেন 'লাইন অফ্ কন্ট্রোল' বরাবর পাক-ভূখণ্ডে পাকিস্তান বহাল তবিয়তে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির চালাইতেছে এবং সহস্রাধিক প্রশিক্ষিত জঙ্গি ভারতের কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশ করিবার জন্য অপেক্ষমান। একই সময়ে আবার ইসলামাবাদে ভারত পাকিস্তানের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বার্তালাপ হইয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইল— এতাদৃশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তান কালহরণ তথা ভারতের বুকে শক্তিশেল হানিয়াছে। দিল্লী-লাহোর বাসযাত্রা এবং আগ্রা-শীর্ষ বৈঠকের পরবর্তী ঘটনা পরম্পরার কথা কাহারও অজানা নাই।

মীর ওয়াইজ ওমর ফারুক বলাবাহুল্য ও আই সি-তে গিয়া কাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, তাহা রাজধানীর রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান করা কিছুই কঠিন নহে। কাশ্মীর উপত্যকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওই রাজ্যের বর্তমান ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের (ওমর ও মেহবুবা) মনোভাব অবিদিত নাই। ইতিপূর্বে ও আই সি-তে পাকিস্তান জানাইয়াছে তাহাদের 'কাশ্মীর' ভারত দখল করিয়া রাখিয়াছে। তাহা মুক্ত করিতে কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে সন্ত্রাসে পাকিস্তান সর্বাধিক মদত দিয়া চলিয়াছে। অদ্যাবধি কোনওরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই।

প্রায় হাজার কুড়ি জঙ্গি (দেশী ও বিদেশী) এবং কয়েক হাজার হিন্দু সন্ত্রাসবাদের যূপকাষ্ঠে প্রাণ হারাইয়াছে। সেই সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগী, লালনপালনকারী ও সমর্থনকারী হুরিয়ৎ নেতা মীর ওয়াইজ ফারুককে সমর্থন করাটা কেন্দ্র সরকারের আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নহে।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার্থে কাশ্মীর বিষয়ক কঠোর নীতি অবলম্বন করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকমদতপুষ্ট অথবা পাকপন্থী সন্ত্রাসীদের দমন করা একান্ত প্রয়োজন। কোনওরকমেই যেন ১৯৫৩ সালের পূর্বাবস্থায় কাশ্মীরকে ফিরাইয়া দেওয়া না হয় ইহাই দেশভক্ত জনগণের দাবী।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূ-ভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধন সম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনও অসুবিধার জন্য নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের এই প্রকাশ তত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হবো—নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হবো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা আদৌ স্বপ্ন-বিলাস নয়

স্বাধীনোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেসী রাজনীতির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গঠন করেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ—যা হলো আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী। ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশন হয় কানপুরে ১৯৫৩ সালে। তিনদিন ব্যাপী এই অধিবেশনের প্রথম দিনে জনসঙ্ঘ সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পাক-ভারত সম্পর্কপ্রসঙ্গে যে ভাষণ দেন সেটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। এই ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে তিনি যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেন, আজকের পরিস্থিতিতে তার তাৎপর্য বিচারযোগ্য। —স্বঃ সঃ

আমরা যদি নিজের ঘর সামলাতে না পারি এবং দেশ বিভাগের ফলে নিদারুণ বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনকে সুব্যবস্থিত করতে না পারি, তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা কোনওদিনই যথাযোগ্য ভাবে সাহায্য করতে পারবো না। স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী বা গোলা-বারুদ দ্বারা জাতির শক্তি নিরূপিত হয় না, প্রকৃত শক্তির উৎস দেশের জনসাধারণ।

স্বরাজ অর্জনের জন্য কাল্পনিক হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর নির্ভর করে কংগ্রেস মস্ত বড় ভুল করেছে। তার ফলে কংগ্রেসকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর আপোস রফা করতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তোষণ নীতির দ্বারা যে বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব দূর করতে চাওয়া হয়েছিল, পরে তাই কুৎসিৎ পরিণতি লাভ করে। ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে যায়। কে শুনেছে যে, যারা ধর্মান্তরিতের বংশধর তারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের দাবি করতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, দেশ বিভাগের ফলে ভারতে অথবা পাকিস্তানে কোথাও সাধারণ লোকের কোনই উপকার হয়নি।

পূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে জনসাধারণের মন ও চরিত্রের উন্নতির মধ্যে স্বাভাবিক সমন্বয় সাধনের ভিত্তিতেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভবপর বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন তা অর্থহীন।

যে জাতি তার অতীত গৌরবে গর্ব অনুভব করতে না পারে—এবং তা হতে প্রেরণা লাভে সমর্থ না হয়, সে জাতি কখনও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠন করতে সমর্থ হয় না। দুর্বল জাতি কখনও মহত্ত্ব লাভ করতে পারে না। আমরা ভগবদ্‌গীতায় প্রচারিত অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। যে কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারবো আমরা এমন শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনের পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা দরিদ্র ও দুর্বলের পীড়নের জন্য তা প্রয়োগের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, সুদূর পল্লী অঞ্চলের যেসব অধিবাসী অধিকাংশ নিরক্ষর, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহকারী, বিভিন্ন প্রথা ও আচার পদ্ধতি অনুসরণকারী, যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা না হবে ততদিন ভারতের উন্নতির কোন আশা নেই। আমরা মনে করি—ভারতে স্বার্থরক্ষার জন্য শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই আমরা শাসন ব্যবস্থার মূল দৃঢ় এবং স্থায়ী প্রচেষ্টা এবং দায়িত্ব বৃদ্ধি করতে পারব।

দেশ এখন গভীর ব্যর্থতার মনোভাবে জর্জরিত। বর্তমান সরকারের প্রকৃতই কিছু করার অভিপ্রায় আছে কিনা তদ্বিষয়ে জনসাধারণ সন্দিহান। তারা এখন আর প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনায় ভুলতে রাজি নয়। তারা প্রকৃতই কিছু দেখতে চায়।

বিভাগোত্তর তিনটি সমস্যা

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশ বিভাগের পর তিনটি সমস্যা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সেই সমস্যাগুলি হলো, কাশ্মীর, পূর্ববঙ্গ এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন।

কাশ্মীর সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতবর্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপনের মূল কারণ যাই থাকুক না কেন, গত তিন বছরে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে নিরাপত্তা পরিষদ হতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রত্যাহার করার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ভারত কোন সুবিধার আশা করতে পারে না। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণকারী হলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৃটেন ও আমেরিকা সহ কয়েকটি প্রধান শক্তি ভারতের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীরে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে, জম্মুর বিষয় বিবেচনায় তাও প্রতিনিধিত্বমূলক হয়নি বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই পরিষদ ভারতভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দুইটি বিষয় থাকবে— একটি জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তানের অধিকৃত এলাকার ভবিষ্যৎ এবং আর একটি এই রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রথমোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা যায় যে, জম্মু ও

পাকিস্তান থেকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পৃথক করার দাবিতে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে মিটিং। ছবিতে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে রয়েছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী (বক্তব্যরত), রামানন্দ চ্যাটার্জী, শ্রীমতী আভা মাইতি প্রমুখ।

কাশ্মীরসহ ভারতের আত্মসম্মান রক্ষা করতে হলে যে কোন উপায়ে শত্রুর কবল হতে ওই অঞ্চলকে উদ্ধার করতে হবে। এই কারণে ভারতকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এইরূপ বলপূর্বক রাজ্যাধিকার ভারত যদি বরদাস্ত করে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী কয়েকটি ব্যাপার উপলক্ষে আমরা আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট রূপেই উল্লেখ করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সংক্রান্ত আমাদের পরিকল্পনা প্রকৃত জাতীয়তার ও কাশ্মীর সহ ভারতের নিরাপত্তার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। শেখ আবদুল্লা ও অন্য সকলে সংবিধান রচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই সংবিধানে সকলের জন্য সমান রক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন অমুসলমানই ভারত হতে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে চান না। তবে কেন শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বাধীনে রাজ্যের অধিকাংশ মুসলমান সমাজ স্বাধীন ভারতের প্রযুক্ত ওই সংবিধান গ্রহণ করতে চান না? এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। আমাদের যুক্তি এই যে, আমাদের সংবিধানে এইরূপ বলা হয়েছে যে, দেশ রক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও সংযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত সংবিধানের অন্যান্য বিধানের প্রয়োগ জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সম্মতির ওপর নির্ভর করবে। রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার বিষয়ে বিবেচনা করেই শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ওই বিশেষ বিধানটি সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

জম্মু ও লাদাখের অধিবাসীরা সম্পূর্ণরূপে ভারতভুক্তির অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা যদি ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তবে তাঁদের জন্য সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের বলা হয় যে, জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগের জন্য চাপ দেওয়া হলে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমিরা ভারতের বিরোধিতা করবে। এই ধরনের যুক্তি মোটেই বোধগম্য হয় না। আমাদের সংবিধান যদি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে যে, মুসলিমরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হতে পারেন অথবা তাঁরা সমান ব্যবহার পাবেন না বলে সন্দিহান হতে পারেন, তাহলে পূর্বোক্ত যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়।

পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সর্বত্র গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের এক কোটি হিন্দুকে রক্ষা করার জন্য দেশবাসী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানিয়েছে। দেশ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা ও সম্মানের সহিত বাস করতে পারবে। ভারতে এখনও ৪ কোটি মুসলমান বাস করেন। অন্যান্য সংখ্যালঘুর সংখ্যা অধিক নয়। তবে সংখ্যালঘুরা সকলেই এখানে শান্তিতে বাস করছেন। পশ্চিম পাকিস্তান হতে হিন্দু সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হয়েছেন। ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এই হিন্দু বিতাড়ন পদ্ধতি মধ্যে মধ্যে অনুসৃত হয়। ফলে হিন্দুরা অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ও নির্যাতন ভোগ করে থাকেন। ছাড় পত্র প্রথা হিন্দু বিদ্বেষবশতঃ পরিকল্পনানুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গে এখনও যে ৯০ লক্ষ হিন্দু রয়েছেন, তাঁরা যদি ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হন, তাহলে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে।

অতএব আমরা একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছি এবং ঘোষণা করেছি যে, পাকিস্তান যা করছে দেশ বিভাগের মূল শর্ত ভঙ্গ করেই তা করা হচ্ছে। সুতরাং দেশ বিভাগকে নাকচ করতে হবে। গান্ধীজী বলেছিলেন, পাকিস্তান যদি সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে সমর্থ না হয়, তবে ভারতকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি করছি না, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের নিজ সরকারের দুর্বল ও কাল হরণের নীতির জন্য পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বেপরোয়াভাবে কাজ করতে সাহসী হচ্ছে। সুতরাং আমরা সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি। আমরা অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি। আমাদের সরকারের ক্লৈব্য বা উদাসীনতার ফলে জাতির মর্যাদায় ও সম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগছে। এটা প্রাদেশিক সমস্যা নয়, এটা একটি জাতীয় সমস্যা। উভয় সরকারের মধ্যে এর বোঝাপড়া হওয়া আবশ্যক। সরকারকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য জনমত গঠন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দু রক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যাপার, সীমান্ত রক্ষা এবং কাশ্মীর সমস্যা যে বিষয়েরই উল্লেখ করা যাক না কেন, আমরা প্রতি পদেই পাকিস্তানের নিকট অপদস্থ হচ্ছি। আমাদের সরকার অসহায় দর্শকের মতো নিষ্ক্রিয়। তাঁরা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হচ্ছেন না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। আমরা এই বিষয় বিবেচনার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবি করছি। যেসব উদ্বাস্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বিষয় সম্পত্তি ফেলে এসেছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দানের বিষয় সরকার কিছুকাল যাবৎ চিন্তা করছেন। এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক তদন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় অনেকদিন অতীত হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ঋণদান সমস্যা নানারূপ দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান হতেও জম্মু ও কাশ্মীরে বহু উদ্বাস্তু ভারতে এসে বসবাস করছেন। ওই সকল রাজ্যে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ওই রাজ্য হতে প্রায় ৫ সহস্র হিন্দু রমণী পাকিস্তানী হানাদারদের দ্বারা অপহৃত হয়। তাঁদের উদ্ধারের জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি।

এইরূপ প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারকে এবং সমানভাবে ভারতের জনসাধারণকে গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতির রূপকার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্যামলেশ দাস

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। মন্ত্রীত্বে দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য এটা ছিল ড: শ্যামাপ্রসাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্র। তিনি প্রথমক্ষেত্র মন্ত্রীত্ব লাভ করেন অবিভক্ত বাংলার প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকারের অর্থমন্ত্রীরূপে। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় ড: শ্যামাপ্রসাদ অর্থমন্ত্রীরূপে ভারতের প্রশাসনে প্রথম আত্মবিকাশ ঘটান। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত এই মন্ত্রিসভা ড: শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর বৃটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ড: শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর ১৯৪৬ সালে ভারতীয় গণপরিষদের নির্বাচনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ড: শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচিত গণপরিষদ থেকেই নেহরুর নেতৃত্বে যে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই মন্ত্রিসভায় হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরূপে ড: শ্যামাপ্রসাদ যোগ দেন। তিনি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ওই মন্ত্রিসভা স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা বলে গণ্য হয়। সেই মন্ত্রিসভাতে ড: শ্যামাপ্রসাদ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই গণপরিষদেই ড: শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। তখনও ভারতের সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। প্রাপ্ত বয়স্কের সাধারণ ভোটাধিকার ভিত্তিক লোকসভাও গঠিত হয়নি। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার ভিত্তিক গণপরিষদেই

শিল্পপতিদের সঙ্গে একটি সভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (১৯৪৯)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতির রচনা ও রূপায়ণে ড: শ্যামাপ্রসাদ যে মৌলিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন তাতে তিনি আজও ভারতের রাজনীতিতে এক কিম্বদন্তী নায়ক হিসেবে স্মরণীয় ও সম্মানিত হয়ে আছেন। ড: শ্যামাপ্রসাদ 'কেতাবী সোসালিস্ট' ছিলেন না কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব কতটুকু থাকবে। বেসরকারী পুঁজির ভূমিকাই বা কি হবে তা তিনি তাঁর ঘোষিত শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। আজ প্রায় সাত দশক পরেও ভারত সরকারের শিল্পনীতি ড: শ্যামাপ্রসাদ নির্ধারিত মৌলনীতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের শিল্পনীতিকে বুঝতে হলে এই ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে সকলের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ড: শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ঘোষিত শিল্পনীতিতে ভারতের সমস্ত শিল্পকে তিনভাগে ভাগ করেন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প (Public Sector), বেসরকারি পুঁজি ও মালিকানা নিয়ন্ত্রিত শিল্প (Private Sector) এবং রাষ্ট্র ও বেসরকারি মালিকানার যৌথ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প (Joint Sector)। ভারতবর্ষের সমস্ত মৌলিক শিল্পকে (Basic Industry) জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার কারণে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করেন। যে সমস্ত শিল্প জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ব্যক্তিগত পুঁজির উপর নির্ভরশীল রাখতে হবে--- সেই শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারি মালিকানাকে পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক করার জন্য তিনি যৌথ উদ্যোগের (Joint Sector) শিল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। আর বেসরকারি পুঁজি ও উদ্যোগের স্বাধীন বিকাশের জন্য বেসরকারি শিল্পসংস্থার (Private Sector) ব্যবস্থাও করেন। মন্ত্রী হিসেবে ভারতে শিল্প প্রসারের জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করে গিয়েছেন। মূলধনের অভাবে ভারতের শিল্পের ঠিকমত প্রসার হচ্ছিল না এবং কয়েকটি বিশেষ

প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি প্রথম ভারতে Industrial Finance Corporation গঠন করলেন। এই করপোরেশন যাতে কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান দখল করতে না পারে তার জন্য শ্যামাপ্রসাদ যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমেই যে মোট ১০ হাজার শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছিল তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২ হাজার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২ হাজার শেয়ার ক্রয় করেছিল। বাকি শেয়ারগুলি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানী ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল। তবে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল যে কোনও প্রতিষ্ঠান তার শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত মোট শেয়ারের দশভাগের এক ভাগের বেশি শেয়ার ক্রয় করতে পারবে না। ভারতের শিল্পবিকাশে শ্যামাপ্রসাদের অবদানের সালতামামী করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে তাঁর প্রয়াসেই ভারতে চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ শিল্প, হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড, সিন্ধ্রি ফারটিলাইজার, ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্, পশ্চিমবঙ্গের রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবল ফ্যাক্টরী প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠে। হলদিয়াতে বন্দর নির্মাণের প্রয়াসের সূচনাও শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াসের ফল। দেশে সমবায়ের (Co-operative) মাধ্যমে শিল্প পরিচালনা যে সম্ভব তার প্রথম স্বীকৃতিও শ্যামাপ্রসাদই দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলভেলী জেলায় সল্ট পানস্ (Salt Pans)-এর কর্মীরা লবণ প্রস্তুত করার জন্য একটি সমবায় গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে জমির জন্য আবেদন জানায়। সে সময় ওই ধরনের চিন্তা ছিল অভিনব। অতএব সরকারি লাল ফিতার বাঁধনে সমস্ত পরিকল্পনা আটকা পড়েছিল। তখন কর্মীদের পক্ষে তাদের নেতা রামস্বামী ভেঙ্কটরমন (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) কর্মীদের হয়ে শ্যামাপ্রসাদের কাছে আরজি পেশ করেন। সমস্ত শুনে শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওই সমবায় সমিতির জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেন। আজ ভারতবর্ষে শ্রমিকদের যে কয়টি সমবায় সমিতি আছে। তিরুনেলভেলীর সমবায় তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতিরূপে রামস্বামী ভেঙ্কটরমণ শ্যামাপ্রসাদের গুণবর্ণনায় এই ঘটনার সবিশেষ উল্লেখ করেছিলেন।

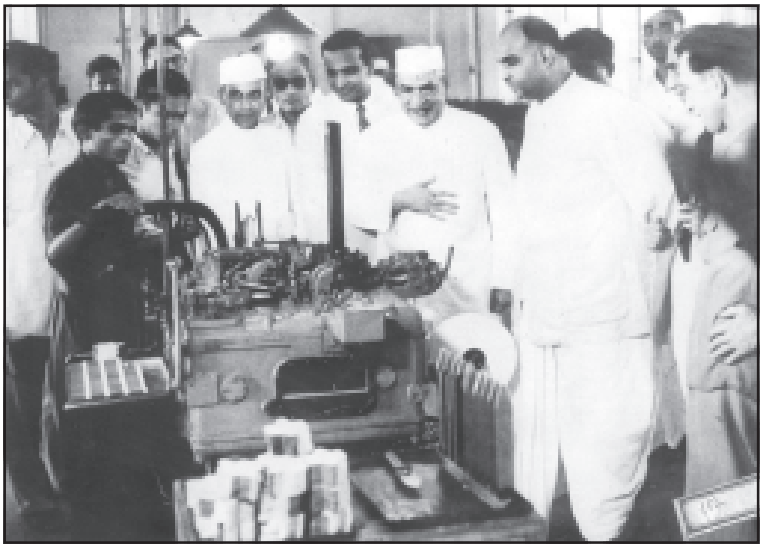

শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ একটি কারখানা পরিদর্শন করছেন।

শ্যামাপ্রসাদ নেহরুর মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন ১৯৫০ সালে। তিনি প্রয়াত হন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৬ সালে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন কালে শিল্পনীতির যে রূপরেখা তৈরি হয় সেটিকে চূড়ান্তরূপ দেবার আগে পণ্ডিত নেহরু দুজন বিখ্যাত সোস্যালিস্ট অর্থনীতিবিদকে পরামর্শ দাতারূপে আমন্ত্রণ জানান। এরা দু'জন হলেন রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অস্ট্রোভিডিয়ানভ ও পোলান্ডের ড: অস্কার লাঙ্গে। তাঁরা দু'জনেই ভারত সরকারের শিল্পনীতিকে সমর্থন করেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট না হয়েও শ্যামাপ্রসাদ সোসালিস্ট অর্থনীতিবিদদের সমর্থন লাভ করেন।

১৯৫৬ সালে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন কালে শিল্পনীতির যে রূপরেখা তৈরি হয় সেটিকে চূড়ান্তরূপ দেবার আগে পণ্ডিত নেহরু দুজন বিখ্যাত সোসালিস্ট অর্থনীতিবিদকে পরামর্শ দাতারূপে আমন্ত্রণ জানান। এরা দু'জন হলেন রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অস্ট্রোভিডিয়ানভ ও পোলান্ডের ড: অস্কার লাঙ্গে। তারা দু'জনেই ভারত সরকারের শিল্পনীতিকে সমর্থন করেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট না হয়েও শ্যামাপ্রসাদ সোসালিস্ট অর্থনীতিবিদদের সমর্থন লাভ করেন।

সেই সময় ড: প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ভারতের বিভিন্ন সেক্টরের শিল্পগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নত করার জন্য যে নীতি নির্দেশ করেন--- যেটা 'মহলানবীশ স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত সেখানেও কার্যত শ্যামাপ্রসাদ উদ্ভাবিত শিল্পনীতিই সমর্থিত হয়। শ্যামাপ্রসাদের অবদানের মূল্যায়ন করতে গেলে এই তথ্যগুলি মনে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই জন্যই শ্যামাপ্রসাদকে স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতির রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। তার প্রবর্তিত নীতিকে দেশ আজও অস্বীকার করতে পারবে না।

শিক্ষাব্রতী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ দিবাকর কুণ্ডু

বাংলার তৎকালীন গভর্ণর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য লর্ড ব্রাবোর্নের সঙ্গে উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অবিভক্ত বাংলায় এমন কিছু মনীষী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যাঁদের উপস্থিতিতে বাংলা ও বাঙালি হয়েছিল সমৃদ্ধ। এঁরাই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি তথা ভারতবাসীর পথ প্রদর্শক। সে কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীকে আধুনিক বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে যে সব বাঙালি শিক্ষাবিদ নিজস্ব প্রতিভা বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকালীন স্থান লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ''ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার বহু সুসন্তান সমগ্র ভারতে এবং কয়েকজন সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বজগতে তো দূরের কথা সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি বা মর্যাদা লাভ করিয়াছে এরূপ বাঙালী নাই বলিলেই চলে। ইহার এক ব্যতিক্রম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।''

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রজীবনেই তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল তারকা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ আপন প্রতিভা ও মেধার বলে এই মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়---কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও অলংকৃত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরই সন্তান শ্যামাপ্রসাদও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন।

শিক্ষাবিদ হিসেবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভালভাবেই জানতেন যে দেশের শিক্ষার সার্থক ও সফল অগ্রগতি ঘটাতে গেলে শুধুমাত্র কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছাত্র ভর্তি করলেই চলে না—এই শিক্ষাকে ফলপ্রদ করতে হলে যাঁরা শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হবেন, তাঁদের হতে হবে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত। তাই প্রয়োজন ছিল প্রকৃত শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রের। অথচ আমাদের দেশে তখনও অমন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। শ্যামাপ্রসাদই প্রথম এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিষয়টি সিন্ডিকেটে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাবিস্তার ক্ষেত্রে অন্য অনেক শিক্ষাবিদের তুলনায় অগ্রবর্তী চিন্তানায়ক ছিলেন।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে শিক্ষাবিদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য নির্বাচিত হয়ে এক অনন্য নজির গড়লেন, যা-সম্ভবত আজও অমলিন।

তিনিই প্রথম উপাচার্য যিনি কোনরকম সংকীর্ণতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস (ইসলামিক হিস্ট্রী) বিভাগ স্থাপন করে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকৃত সাক্ষ্য রাখেন। যাঁরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করেন, তাঁরা প্রায়ই এই তথ্যটি বিস্মৃত হয়ে থাকেন।

১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতের কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে যে সব সমাবর্তন ভাষণ দেন—সেগুলিই তাঁর মৌলিক চিন্তার বাহন।

আমরা যদি তাঁর প্রদত্ত এই সব সমাবর্তন ভাষণ একটু সতর্কভাবে অনুসরণ করি,তাহলে

দেখব তাঁর শিক্ষা—চিন্তা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সাধনে কতখানি সফল ছিল।

শিক্ষাবিদ, চিন্তানায়ক, উপাচার্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে। আর শেষ ভাষণ দেন ১৯৫২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। দিল্লির এই সমাবর্তন ভাষণটি স্বাধীন ভারতে প্রদত্ত একমাত্র ভাষণ, বাকিগুলো সবই পরাধীন ভারতে প্রদত্ত, তিনি তাঁর যুক্তির মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকার শাসিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটির দিক উদ্‌ঘাটিত করে, কিভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন এবং ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাধারা

বাংলার তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার আনীত 'সেকেন্ডারি এডুকেশন বিল'-এর প্রতিবাদ সভায় অন্যান্যদের সঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (১৯৪০)

যে কখনই আমাদের দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ ঘটাতে পারে না, তা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্তগুলি হ'ল—

(ক) মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা; সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণ; বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা।

(খ) প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ চর্চা ও গবেষণার জন্য আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

(গ) মহিলাদের জন্য গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠক্রমের সূচনা।

(ঘ) ছাত্রদের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

(ঙ) ছাত্রদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে ইনফরমেশন এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট বোর্ড স্থাপন।

(চ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন।

(ছ) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে মিলিটারি স্টাডিজের ব্যবস্থা।

(জ) ফলিত পদার্থবিদ্যায় কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (এখনকার ইনফরমেশন টেকনোলজি) পাঠক্রম চালু করা।

(ঝ) ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম. এ. পর্যন্ত ভূগোল পড়াবার ব্যবস্থা।

(ঞ) কৃষিবিদ্যালয় অধ্যয়নের ব্যবস্থা।

(ট) মুসলিম হিস্ট্রী এবং সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে নতুন বিভাগের পরিকল্পনা।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষাপ্রবাহ যদি কোনও স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে শিক্ষা শুধু তার গুরত্বই হারাবে না, তা হবে অসম্পূর্ণ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব স্মরণ করে তিনি তৎকালীন বৃটিশ সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন---''এই সরকার তার শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলো যন্ত্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাই তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেনি। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন—এই তিন শ্রেণীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখার ফলে একটির ক্ষতি করে অন্য একটির উন্নতির পরিকল্পনার কথা শোনা যায়।" এই ধারা যে ভ্রান্ত তা তিনি বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে বলেন—''আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুস্থ নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। আমরা দেখতে পাই যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে এবং জনগণকে সৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে সৎকাজে প্রণোদিত করে ও তাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করে তাদের অন্তরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে"।

এইখানেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি, তিনি আরও বলেছেন—''আমরা দেখতে চাই যে মাধ্যমিক শিক্ষা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ধারায় প্রকৃত শিক্ষা দেবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। এবং শিক্ষাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধিজনিত, হিতকর ও উৎপাদনশীল কাজের সন্ধান দিচ্ছে। সব শেষে আমরা দেখতে চাই যে বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ওই সব শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে উচ্চস্তরের শিক্ষাদান করছে।"

১৯৪৩ সালে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক নয়, এর মধ্যে তিনি দেখতে পাননি জাতীয় শিক্ষার কোনও সুষ্ঠু নীতি। তাই তিনি বারবার জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন ''আমরা জাতীয় শিক্ষার এমন একটি সুষ্ঠু নীতি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই যা সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে।" তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক ভাবে বিস্তারলাভ করে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পৌঁছে এই শিক্ষা এক সর্বব্যাপী রূপ লাভ করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার যে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিচালিত হওয়া দরকার—তিনি তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারতীয় নারীত্বের শাশ্বত রূপটি অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেশ্যেই নারী সমাজকে তাদের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই যোগ্য করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রথমটি আঞ্চলিক ভাষা যা মূলত ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা; দ্বিতীয়টি জাতীয় ভাষা (ন্যাশানাল ল্যাংগুয়েজ), যা মূলত ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ রক্ষা করার ভাষা। একে রাষ্ট্রভাষা বলেও চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাই হলো শিক্ষণীয়; আর তৃতীয়টি হলো আন্তর্জাতিক ভাষা (ইন্টারন্যাশানাল ল্যাংগুয়েজ) যা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জরুরি, তা হলো ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী ভাষাকে শাসক বৃটিশদের ভাষা বলে উপেক্ষা করাকে তিনি, অদূরদর্শিতা বলেই বিবেচনা করেছেন। তবে এই সঙ্গে তিনি বিস্মৃত হননি ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। কেননা তিনি ভালভাবেই জানতেন ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পবাণিজ্য কলা ভাস্কর্য ইত্যাদি অজস্র মণিমুক্ত রক্ষিত আছে এই ভাষাভাণ্ডারে। তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন এই ভাষাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট মিটিংয়ে বক্তব্যরত শ্যামাপ্রসাদ। (১৯৪৯)

শিক্ষাব্রতী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন—"একটি জাতির জীবন অথবা মৃত্যু নির্ভর করে মানুষের চরিত্রের ওপর। সম্পদ, অস্ত্র, সামরিক ভাণ্ডার, সুসংবদ্ধ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী জাঁকজমক বাড়ায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে যুব- সমাজ গড়ে ওঠে, তারই উপরই নির্ভর করে জাতির জীবন ও মৃত্যু।"

তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল লক্ষ্যটি যে আদর্শবান, চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা তা সন্দেহাতীত। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা দেখব, ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে এই কথাগুলি বলে শেষ করেছিলেন তাঁর ভাষণ।

"With our ancient heritage, with the spirit of India still ennobling the mind of man, with our vast resources of manpower and buried wealth, with our undoubted capacity of assimilation of new ideas, let us, irrespective of all differences, make supreme Co-operative, effort to raise our motherland to a higher and a nobler life of existence, bringing joy and contentment to all, making her a mighty instrument for the maintenance of world peace and freedom."

১৯৫৩ সালে সম্ভবত এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁর মৃত্যুর কাল পর্যন্ত তিনি যে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ও শিক্ষা-চিন্তায় অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, তার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে।

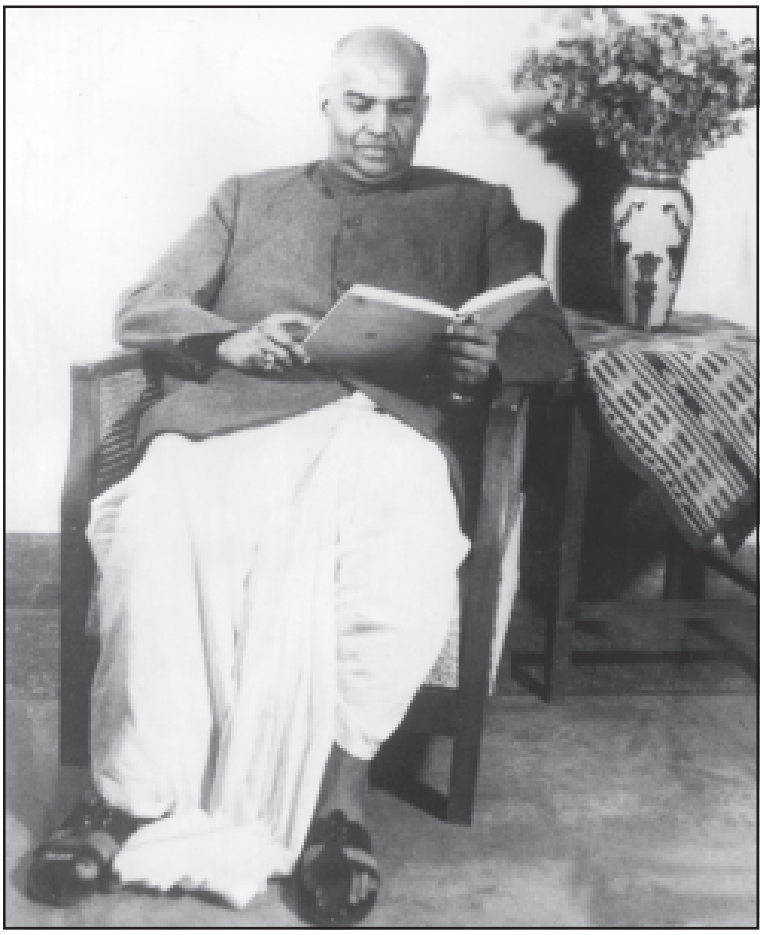

জাগ্রত ভারতে ক্ষীয়মাণ হিন্দু বাঙ্গালী ও শ্যামাপ্রসাদ

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

মুক্তির মন্দির প্রাঙ্গণে শত শত বীর সৈনিকের রুধির স্নানে সিক্ত হয়ে প্রায় হাজার বছর পর এল যে স্বাধীনতা তাও বৃটিশ শাসক দিয়ে গেল তাঁদের দর্শনে বিশ্বাসী ভারতীয় নিরীশ্বরবাদীদের হাতে! সন্ধির সে রাতে বীর সৈনিকরা ছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই কক্ষের বহুদূরে। গান্ধীজীও ছিলেন অন্ধকারে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর "Struggle For Freedom" বইটিতে লিখছেন, "Gandhi believed that the partition of India was favoured by the Congress leaders, but not by the people. Two days after his interview with Mountbatten on 4th May, 1947 Gandhi told N.K. Bose : 'Mountbatten had the cheek to tell me, "Mr. Gandhi, today the Congress is with me and no longer with you." Bose asked, 'what did you say in reply?' Gandhi answered, 'I retorted, but India is still with me." (N.K. Bose, Studies in Gandhism, p. 284), (R.C. Majumdar, Struggle For Freedom, p. 783)।

একমাত্র মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদী নেতাদের সুবিধার্থে শীঘ্র ক্ষমতা দখলের আকুতির ফলে আবদুল গফফুর খানের স্নেহধন্য খান ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ক্ষমতাসীন ছিল তাঁদেরও আপত্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপুল সংখ্যালঘু (হিন্দু) সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তাড়াতাড়ি ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার লোভে দেশভাগ মানা হলো বৃটিশ স্বার্থ চরিতার্থ করতে। ওই উপমহাদেশে স্বাধীনতার পরও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বৃটিশ গুণমুগ্ধ নিরীশ্বরবাদী শক্তি দেশভাগে সায় দিল। হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে যে পশ্চিমের গুণমুগ্ধ ভারতীয় নেতৃত্ব দেশভাগ মানলেন তাঁরাই আবার সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পর ক্ষমতা ধরে রাখতে ভোটের রাজনীতির স্বার্থে জনবিনিময় মানলেন না। কারণ হিন্দুর ভোট কালক্রমে ভাগ হবে বিভিন্ন দলে, ফলে মুসলমান ব্লক ভোটের সাহায্যে ক্ষমতায় থেকে যাওয়া যাবে আদি-অনন্তকাল ধরে। তাই দর্শন, নীতি ও আদর্শহীন যে আকুতি তাঁদের ক্ষমতা দখলের খেলায় মাতালো তারই স্বাভাবিক পরিণতি হলো। স্বাধীনোত্তর সুদীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে সেই মতাদর্শ ও তাঁদের সঙ্গে একমত এমন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট শাসকের শাসনের পর এদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিপরায়ণ দেশগুলির অন্যতম হিসাবে লজ্জাবৃত হয়ে বিশ্বসভায় বিরাজমান।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পরিণতির কথা অনুধাবন করেই সেদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে নিজস্ব আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। যাঁরা রাষ্ট্রবাদকে হৃদিমন্দিরের প্রাণ কেন্দ্রে

রেখে নীতি নির্ধারণে এগোবে। শ্রদ্ধা রাখবে ভারতের সনাতন দর্শনে, শাশ্বত আদর্শে। তাঁদের ভক্তি থাকবে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের প্রতি এবং তাঁরা ভাবেন না যে তাঁরা, "Hindu by accident, Muslim by culture and British by education." শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে। উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও বালগঙ্গাধর তিলকের দেশপ্রেমের ধারায়।

স্বামীজী বেদান্তকে সার্বজনীন ধর্মের রূপ বলেই মনে করতেন কারণ বেদান্তের দর্শনে বৈরিতা শেখায় না। একটি ধর্মই সত্য, সেই ধর্ম বিশ্বাসই

নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর হাওড়া স্টেশনে শ্যামাপ্রসাদকে উষ্ণ সংবর্ধনা।

একমাত্র পৃথিবীতে বিরাজ করবে, সকল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে ছলে বলে কৌশলে সে ধর্মের ছত্রছায়ায় আনতেই হবে, না হলে জগতে প্রলয় ডেকে আনতে হবে। ভয়েই হোক, ভক্তিতেই হোক, ভোগবাদকে প্রশ্রয় দিয়েই হোক, প্রলোভন দেখিয়েই হোক সেই ধর্মকেই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় অত্যাচার স্বীকার করে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এমত বিশ্বাসকে বেদান্ত দর্শন প্রশ্রয় দেয় না, সমর্থনের তো প্রশ্নই আসে না। তাই স্বামীজী মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন হিন্দু ধর্ম যেরূপ উদারভাবে সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেয় অন্যান্য ধর্ম সেরূপ উদারতা দেখালে ধর্ম জগতে অনেক আগেই শান্তি স্থাপিত হোত। এই ভাবগম্ভীর হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু জাতির রক্ষার্থে শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রবাদকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষীয় ধারায় বিশ্বাসী ভারতীয় নেতৃত্ব নব উদ্যমে সংবিধানের মধ্যে সনাতন ভারতীয় ধারাটির প্রতি নির্লিপ্ততার প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। যে "ধর্মনিরপেক্ষতার" কথা জোরালো ভাবে বলছে নিরীশ্বরবাদী শক্তি সেই শব্দটিই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ঢোকানো হয়েছে। মূল সংবিধানে যা ছিল "Sovereign Socialist Secular Democratic Republic of India." শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া বক্তৃতায় ৩০ মে বলেছিলেন, "I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatan Dharma; with it moves and with it grows." (Sri Aurobindo, Collected Works, Volume 2, page 10)। শ্যামাপ্রসাদ আত্মস্থ করার চেষ্টা করলেন বিবেকানন্দের 'স্বদেশ মন্ত্রটি', এগিয়ে এলেন স্বজাতি, স্বধর্মাবলম্বীর রক্ষার্থে। পশ্চিমবঙ্গ আমরা পেলাম তাঁরই প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগের ফলে।

নেহরুজীর বিখ্যাত বই "The Discovery of India"-তে তিনি "What is Hinduism" প্রবন্ধটিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর অশেষ অমিল। তাঁর সে লেখার ছত্রে ছত্রে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। নেহেরু লিখেছেন, "Hinduism, as a faith, is vague, amorphous, many sided, all things to all men." এমনকী গান্ধীজীর সংজ্ঞাকেও তিনি মানতে পারেননি। নেহরু লিখছেন, "Truth and non-violence so says Gandhi : but many eminent and undoubted Hindus say that non-violence, as Gandhi understands it, is no essential part of the Hindu creed. We thus have truth left by itself as the distinguishing mark of Hinduism. That of course, is no definition at all." হিন্দুধর্মে যাঁর এত বিরাগ তাঁর ইসলামে অসম্ভব অনুরাগ। ভারতীয় সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাব বোঝাতে কী নিপুণ প্রচেষ্টা, যুগ সন্ধিক্ষণে হিন্দুর ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে যিনি দাঁড়ালেন তিনি জন্মেছিলেন হিন্দু পরিবারে কিন্তু বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় হিন্দুর অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানে তাঁর কোনও ভক্তি ছিল না। নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতেনও না। নিরীশ্বরবাদী ছিলেন আজীবন। Agnostic, atheist এই ছিল তাঁর ধর্মের সম্পর্কে পরিচয়। ফলে তাঁর স্নেহধন্য মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতারা হিন্দুর দুঃখ কষ্ট নিয়ে উদাসীন থাকবেন সেটাই তো স্বাভাবিক।

সেখানে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সশ্রদ্ধায় বলেছেন, "From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of Science seem like echoses, to the low ideas of idolatry with its multifarious mythology the agnosticism of the Buddhists, and the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religions. "(Swami Vivekananda, The Complete works, Volume 2, page 06)। নিরীশ্বরবাদীদের বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অসীম অজ্ঞতা ও বিষম অশ্রদ্ধার জন্য বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত ধর্মপ্রচারকদের মতামতের সঙ্গে তাঁদের মতামতের পার্থক্যও সহজেই অনুমেয়। সেখানে ভাবের ঘরে চুরির মাধ্যমে ঐক্যমত্য খোঁজার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র ও পাঠকের সঙ্গে তঞ্চকতার সমান। বৃটিশ দেশত্যাগের পূর্বে পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অসম্ভব মোহবদ্ধ নেহরুকেই জাতীয় নেতৃত্বের কর্তা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যায়। পরবর্তী সময় ইতিহাস রচনায় তাঁর নেতৃত্বকে মহান ও বিরাট করে দেখানোর পেছনে সরকারী চাতুরী কিছু কম ছিল না। যখন একের পর এক দেশে মুসলমান আক্রমণে ধর্মান্তরের মাধ্যমে প্রাচীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আক্রমণকারীর ধর্মগ্রহণ করে আক্রান্তের সঙ্গে সন্ধি করেছে। পারস্য প্রাচীন Zoroastrian ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে, মিশর তার সুপ্রাচীন ইতিহাসকে সংগ্রহশালায় পাঠিয়েছে। ভারতবর্ষ তা করেনি। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এই মহানতাকে অনুধাবন করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদও বিবেকানন্দের এই দর্শনে নিজেদেরকে আলোকিত করে রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন।

সোমনাথ মন্দির রক্ষায় ৫০ হাজারেরও বেশি হিন্দু প্রাণ দিয়েছে। ১৭ বার ভাঙ্গা হয়েছে সোমনাথ মন্দির কিন্তু হিন্দু আত্মসমর্পণ করেনি। যদি ইংরেজ বলতে পারে সে কোনওদিনও পরাধীন হয়নি। ভারতবর্ষ বলতে পারে তার ধর্ম সংস্কৃতি সুপ্রাচীন, সে ধর্মান্তরিত হয়নি। ইংরেজের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছেদ নেই, ভারতবর্ষের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসেও ছেদ নেই। কিন্তু ইতিহাস বই লেখা হয় অন্যভাবে, যাতে সেটা পড়ে মনে হয় ভারতে বিদেশীরা এসেছে শাসন করে চলে গেছে। বিদেশীরা শুধুমাত্র রাজনীতি, অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করেছে, হিন্দু বুক দিয়ে তাঁর ধর্মকে রক্ষা করেছে। আমাদের পিতৃপূর্বপুরুষরা মার খেয়েও মাকে বিক্রি করেনি। প্রাণ দিয়ে স্বধর্মকে রক্ষা করেছে। সে ইতিহাস লেখা হলো না। কারণ নিরীশ্বরবাদীরা তা চায়নি। রাষ্ট্রীয় জীবনে যিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন সেই আদি শঙ্করাচার্য রাষ্ট্রপিতা নন। ইতিহাস বইয়ে তিনি ব্রাত্য।

শ্যামাপ্রসাদের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দর্শনে বিবেকানন্দের বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। স্বামীজী বলেছেন, ''আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির মূলভিত্তি, মেরুদণ্ড বা জীবনকেন্দ্র—একমাত্র ধর্ম। অন্যে রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্য বলে অগাধ ধনরাশি উপার্জনের গৌরব, বাণিজ্যনীতির শক্তি ও তার প্রচার, বাহ্যিক স্বাধীনতালাভের অপূর্ব সুখের কথা বলুক। হিন্দু এসব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। তার সঙ্গে ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা বলুন...অন্যান্য দেশের তথাকথিত অনেক দার্শনিকের চেয়ে আমাদের দেশের সামান্য কৃষকের পর্যন্ত এসব তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞান আছে।...ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান, একমাত্র ভগবান। যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুবরণ করেও ভগবানকে ধরে থাকবে, ততদিন তার আশা আছে।" তাই ধর্মতন্ত্র নয় ধর্মতত্ত্বে স্থিত থেকে, পরধর্মের প্রতি বিরাগ নয় তবে স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ রেখে, ভারতীয় মুসলমানের প্রতি ঘৃণা নয় তবে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানের ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখিয়ে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শে দীক্ষিত রাষ্ট্রবাদী শক্তির পাশে থাকতে হবে। সে পথেই আসবে সুরক্ষার সাথে সুশাসনও।

তথাকথিত নিরপেক্ষতার আড়ালে বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব রয়েছে পুরো মাত্রায়। পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকা আছে বলে মনে হয় না। সত্য তথ্য পেতে গেলে প্রায় সবকটি বড় ছোট কাগজ পড়ে মতামত তৈরি করতে হবে। একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব। বড় পত্র-পত্রিকা এর সুযোগ নিয়েছে ও নিচ্ছে। তাই যে সব সংবাদমাধ্যম উদারবাদ নিয়ে মুখর সে সকল কাগজও কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক, কেউ প্রকাশ্যে কেউ গোপনে। হিন্দু মন্দিরের প্রণামীর টাকাও হিন্দু স্বার্থে ব্যয় না করে পঞ্চভূতে লুটে খাবার আইনানুগ ব্যবস্থা রয়েছে। সে অর্থেই অনায়াসে প্রচার মাধ্যম হিন্দু দরদী হতে পারত। মন্দিরের সম্পত্তি লুঠ সমানে চলছে মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত। শুধু পদ্ধতিটা বদলেছে মাত্র। স্বধর্মের পক্ষে কথা বলা, তাকে রক্ষার চেষ্টা করা যেন ঘৃণিত কাজ। হিন্দুর পক্ষে কথা বলাকে এভাবেই তুলে ধরা হয়েছে হিন্দুর সামনে স্বাধীনতা উত্তরকালে। হিন্দুর মন্দিরের প্রণামীর টাকা ঘুরপথে হিন্দু বিরোধী কার্যে ব্যয় হচ্ছে বলে সন্দেহ প্রবল হচ্ছে।

এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার সন্ধান দিচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের দর্শনে উদ্বুদ্ধ মানুষজন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গোয়াসহ সমগ্র পশ্চিমভারতে মধ্যপন্থী দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে মোকাবিলা করার জায়গায় চলে এসেছে রাষ্ট্রবাদী সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী শ্যামাপ্রসাদের স্নেহধন্য রাজনৈতিক শক্তি। উত্তরভারতে দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে এককভাবে ও পাঞ্জাবে সহযোগী নিয়ে রাষ্ট্রবাদী শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী, হরিয়ানায় মুসলমান জনসংখ্যা নামমাত্র। উত্তরপ্রদেশে পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা চলেছে। দক্ষিণে কর্ণাটকে শক্তি অর্জন করে নিয়েছে রাষ্ট্রবাদ। তামিলনাড়ুতে মুসলমান জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার বিচারে নগণ্য। উত্থান প্রয়োজন অন্ধ্রপ্রদেশে। তবে তেলেঙ্গানা নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ এখন উত্তাল। নিরীশ্বরবাদী শক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী কেরলে। সেখানে হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারাতে চলেছে। পূর্বেও এই একই শক্তির বিকাশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এবং অবৈধ বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে প্রতি তিনজন পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানের একজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। একসময় এরাই পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করেছিল। আজ যেখানেই ক্ষমতায় এসেছে নিরীশ্বরবাদী ও পশ্চিমঘেঁষা মধ্যপন্থী শক্তি সেখানেই পরোক্ষভাবে হিন্দুস্থানে পাকিস্তানের উত্থানের সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার ভারতে তৃতীয় মুসলমান গরিষ্ঠ রাষ্ট্রের প্রকাশের পথ ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে। পূর্বে অন্য তিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার ও অসমে কোথাও এককভাবে কোথাও সহযোগীসহ রাষ্ট্রবাদী শক্তি তার উপস্থিতি প্রমাণ দিয়েছে। অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা কোথাও দশ শতাংশের বেশী নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বুঝতে হবে বিপদ এখন অস্তিত্ব রক্ষার। ভারত তার মত করে সামলে উঠছে। ধীরে হলেও লক্ষ্য স্থির রয়েছে শ্যামাপ্রসাদের দর্শনে। ভারতের নব প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে রাষ্ট্রবাদীশক্তি শাসক বা প্রধান বিরোধী শক্তি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত।

কাশ্মীরে যাওয়ার পথে শ্যামাপ্রসাদ – ১১ মে ১৯৫৩।

সমগ্র ভারতবর্ষকে নিরীশ্বরবাদী কুট চালে আবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। বিপদ হবে বঙ্গে, সংখ্যাগরিষ্ঠকে নিরপেক্ষতার নিরীশ্বরবাদে ক্লীব করে আগ্রাসী মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে সমগ্র জাতিকে বিপদের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা হলে যাঁরা পাকিস্তানের জয় প্রার্থনা করেন। আর যাঁরা সেটা ইস্টবেঙ্গল- মোহনবাগানের সমর্থনের সঙ্গে বা সেটা অনাবাসী ভারতবাসীর ইংল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ভারতকে সমর্থনের সঙ্গে তুলনা করে লঘু করে দেওয়ার কুচক্রে লিপ্ত থাকে, তাঁরা

পেট্রোডলারে সিক্ত। তাহলে বুঝতে হবে যাঁরা পাকিস্তানকে সমর্থন করছে ও ভারতে থাকছে তাঁরা অনাবাসী পাকিস্তানী। তবে যাঁরা ভারতে এই অনাবাসী পাকিস্তানিদের ভোটের স্বার্থে ভারতপ্রেমী বলছেন, স্বাধীনতার আগে দেশভাগের পরে ভারতের বর্তমান প্রদেশগুলিতে বসবাসকারী মুসলমানরা তৎকালীন মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবীসহ স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম লিগকে কিভাবে ভোট দিয়েছিল ইতিহাস পাঠ করলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু পশ্চিম ঘেঁষা নিরীশ্বরবাদী মধ্যপন্থীরা স্বাধীনতার পরে মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট সরকার গঠন করে বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁদের হৃদয় কার সঙ্গে কোথায় বাঁধা।

যাঁরা ভারতে অন্যান্য প্রান্তে চিহ্নিত বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাকের সময় ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে, ভোটে জেতার জন্য রেশন কার্ড দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে খাল কেটে কুমীর আনার পথ প্রশস্ত করে। মুসলমান দেগঙ্গায় মন্দির ভাঙ্গলে লঘু করে দেখায় ও খবর না ছেপে চেপে যায় তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকে ভবিষ্যতে কাশ্মীর হবার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালীকে পাটনায় নয়তো বর্হিবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যেতে হবে। আর নিরীশ্বরবাদী বাঙ্গালীরা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে নিশ্চিন্তে বঙ্গে শাসন ক্ষমতায় থেকে যাবে। হিন্দু বাঙ্গালীকে শ্যামাপ্রসাদের দর্শনকে বুঝতে হবে। বিপদ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলে ভোলানো উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, যখন প্রদেশটাই হাতের বাইরে চলে যেতে বসেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর জমিগুলির মধ্যে অন্যতম বঙ্গীয় ব-দ্বীপ। তার তিনভাগের একভাগ পশ্চিমবঙ্গ। তিনভাগ বাংলাদেশ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। তারপরও সে পরিবার পরিকল্পনায় মন দেয়নি। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ভারতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে অনৈতিকভাবে। সীমান্তে দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে আবির খেলার ছবি ছেপে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ২২ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশে নেমে যাওয়ার হৃদয়বিদারক সত্য ঢাকা যাবে না। তাই আশু সাবধান না হলে হিন্দু ভারত রক্ষা পাবে কিন্তু ভঙ্গ-বঙ্গ ভেসে যাবে মুসলমান অনুপ্রবেশকারী দ্বারা যখন পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার আজ ৩০ শতাংশ মুসলমান বেড়ে ৫০ শতাংশের উপরে চলে যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

মঠ মিশনগুলিকে ভক্তদের সজাগ করতে হবে রাষ্ট্রবাদে। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাক কিন্তু বিদেশী নাগরিক দেশে ঢুকে নাগরিক সুবিধা নিয়ে ভারত ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসলে বিপদ সমগ্র ভারতবাসীর। ভক্তকে সেখানে নির্লিপ্ত নয় নির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রবাদী শক্তির পাশে দাঁড়াতে শেখাতে হবে। হিন্দুর সমর্থন নিয়ে হিন্দুর অনিষ্ট কার্যে কোন শক্তিরা লিপ্ত সেকথা ভক্তকে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে নিরীশ্বরবাদের ছত্রছায়ায় হিন্দু জাতিকে নিরস্ত্র করে হিংস্র সন্ত্রাসবাদী তালিবানি শক্তির সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যে মধ্যপন্থী শক্তি তারা হিন্দুর সর্বনাশের পথকে সুগম করার চেষ্টায় রয়েছে। এই ক্লীবত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে গীতার সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে হবে। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে স্বামী বিবেকানন্দের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে নিজেকে জাগ্রত করে শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় স্বধর্ম রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে। সেটাই হবে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণাম।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ

ভাস্কর চৌধুরী

১৯৩৯ সালের শিবরাত্রি তিথি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ের সামনের মাঠে 'হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি' সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ দণ্ড হস্তে আশ্রমের প্রবেশ পথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মেলনের সভাপতির আগমনের প্রতীক্ষায়। যথাসময়ে সভাপতি উপস্থিত হলেন। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান স্বামীজীকে প্রণাম করলেন। আচার্যদেব স্বয়ং সভাপতিকে নিয়ে গেলেন সম্মেলনের মঞ্চে। স্বামীজীই সভাপতিকে বরণ করলেন। নিজের গলার মালা খুলে প্রণবানন্দজী পরিয়ে দিলেন শ্যামাপ্রসাদের গলায়। ভক্তি-আবেগপ্লুত শ্যামাপ্রসাদ পুনরায় আচার্যদেবকে প্রণাম করলেন।

প্রণবানন্দজী তাঁর নিজের গলার মালা শ্যামাপ্রসাদকে পরিয়ে দেওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হলো। বিস্মিত হলেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরাও। অনুষ্ঠান শেষে তাদের সকলের বিস্ময়ের নিরসন করলেন প্রণবানন্দজী নিজেই। বললেন— ''বাঙ্গালী হিন্দুকে রক্ষা করার ভার আজ আমি ওঁর হাতে সমর্পণ করলাম। সমস্ত হিন্দুর নেতা নির্বাচন করে দিলাম।''

ওই দিনের সম্মেলনে হিন্দুর মান-ইজ্জত, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে পাঁচ লক্ষ লোকের এক রক্ষীদল গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভূত-ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দজী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই আপন দিব্যদৃষ্টিতে বাঙ্গালী হিন্দুর যে দুর্দশার চিত্র দেখেছিলেন, আমরা তার সত্যতা আজও প্রত্যক্ষ করে চলেছি। হিন্দুর ঘরের রমণীরা লুণ্ঠিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছেন, হিন্দুর ঘর-বাড়ী দুর্বৃত্তের রোষানলে দগ্ধীভূত হয়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, হিন্দুর দেব-দেবী-মন্দির বিধর্মীর দ্বারা কলুষিত হচ্ছে। অথচ হিন্দুরা নিবীর্য ক্লীবের ন্যায় অসহায়ভাবে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে।

প্রণবানন্দজী তাঁর নিজের গলার মালা শ্যামাপ্রসাদকে পরিয়ে দেওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হলো। বিস্মিত হলেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরাও। অনুষ্ঠান শেষে তাদের সকলের বিস্ময়ের নিরসন করলেন প্রণবানন্দজী নিজেই। বললেন— ''বাঙ্গালী হিন্দুকে রক্ষা করার ভার আজ আমি ওঁর হাতে সমর্পণ করলাম। সমস্ত হিন্দুর নেতা নির্বাচন করে দিলাম।''

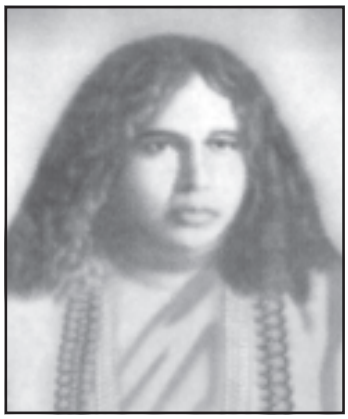

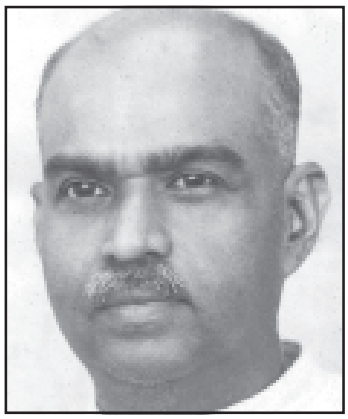

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দুর দুর্বলতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন—''হিন্দুর সব আছে, নেই কেবল সংহতি। 'হিন্দু'কে 'হিন্দু' নামে ডাকলে কেউ সাড়া দেয় না। এবং হিন্দুভাই-এর বিপদে আর এক হিন্দু এগিয়ে আসে না। জাড্য-জড়তায় হিন্দু আজ মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমি হিন্দুকে হিন্দুনামে ডাকতে চাই।'' হিন্দুর মধ্যে আত্মশক্তি ও সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁর হিন্দু-মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল গঠন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সবচেয়ে বড় অবদান পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা। তিনি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে তৎকালীন বৃটিশরাজকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সঙ্গেই যুক্ত রাখতে

হবে। ক'দিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার শাসকদল যারা রাইটার্সে বসে মন্ত্রিত্বের গদি উপভোগ করছেন, তাঁরা একবারও স্মরণ করেন না যে শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে পশ্চিমবঙ্গসহ পুরো বাংলাদেশটাই পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে যেত। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু লোকসভায় একমাত্র শ্যামাপ্রসাদকেই সমীহ করতেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতায় দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হোত। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর ভাবধারা সঞ্চালনের জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন রাজনৈতিক দল 'জনসঙ্ঘ' যা বর্তমান বি জে পি'রই পূর্বসূরী।

এহেন ব্যক্তিত্বশালী শ্যামাপ্রসাদ আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কাছ থেকে তাঁর রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন—

''স্বামীজী মহারাজের (স্বামী প্রণবানন্দজী) সহিত বহুবার আলাপের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কয়েকবার আমি তাঁহার আহ্বানে বালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সম্মেলনে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির সময় বক্তৃতা ও সভাপতিত্ব করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে তিনি আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা।... আমার মনে হয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সেই ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, যে যুগে হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সভ্যতা আবার শান্তিপূর্ণ অভিযানে বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ হইবে। এবং সেই গৌরবময় যুগের চিত্র দেখিয়াছিলেন আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ— সেই দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য দেশকে জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই। ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময় ভারতের দিব্যস্রষ্টা স্বামী প্রণবানন্দ। তাঁর উদ্দেশে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।''

(উদ্ধৃত অংশটি 'মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ'—সংকলক স্বামী আত্মানন্দ—থেকে গৃহীত।)

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ও সাধনা কি ব্যর্থ হবে?

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

(সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে রাহুমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে পশ্চিমবঙ্গের উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই মনে হচ্ছে। এই সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে স্বস্তিকা'র পাতায় অনেক লেখা লিখেছি; এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কারণ অন্ধ অন্ধকে অনুসরণ করে যদি গর্তে পড়ে, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের দশাও তাই। তবু চোখের সামনে পশ্চিমবঙ্গের বিনাশপর্ব দেখে, তার সৃষ্টি লগ্নের ও সৃষ্টিকর্তার কথা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত '**হিন্দুস্থান**' পত্রিকার পাতা থেকে পাঠকের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো : সংকলক)

পাকিস্তান প্রতিরোধে লক্ষ হিন্দু যুবককে হাসিমুখে
আত্মাহুতির ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে
বাঙ্গালী হিন্দু সম্মেলনে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

কলিকাতা, ১৬ মার্চ—নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি ও বাংলার বরেণ্য নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অদ্য প্রাতে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত বাংলার সমস্ত জেলার সর্বশ্রেণীর হিন্দু প্রতিনিধিদের এক বিরাট সভায় বাঙ্গালী হিন্দুর পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ''হিন্দুদের এই জীবন-মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারি তবেই বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাস বজায় থাকিবে। আমরা যে গুরুতর দায়িত্ব আজ গ্রহণ করিলাম তাহার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। মুখে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া গেলেই কর্তব্য শেষ হইবে না— একদিনও বিলম্ব না করিয়া আমরা প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় ও ইউনিয়নে আমাদের চাষী ভাইদের, মজুরদের ও প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে হিন্দুত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া গঠনমূলক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়িব।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত রিফিউজি সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে দিল্লিতে শ্যামাপ্রসাদের বৈঠক।

> **যদি আমরা পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করিতে পারি তবে সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য হিন্দুরাও আমাদের সহিত আসিয়া দাঁড়াইবে; না---আমাদের তখন, তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। আমরাও তখন ভারতের অন্যান্য হিন্দু ভাইদের ইচ্ছানুসারে সাহায্য করিতে পারিব। পৃথকরাষ্ট্র গঠন করিয়া আমরা সমস্ত ভারতের হিন্দুকে হিন্দুত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করিব।**

রিফিউজিদের সঙ্গে কথা বলছেন শ্যামাপ্রসাদ।

বাংলার হিন্দু ছাত্রমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন যে, আজ তাহাদের বিরাট দায়িত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে। ভবিষ্যতে তাহাদিগকেই দেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। অতপর ডঃ মুখার্জি বলেন,—

''আমাদের এই প্রচেষ্টায় কোনও সঙ্কীর্ণতা, ধাপ্পাবাজী, পরাজয় বা হতাশার ভাব নাই। হিন্দুকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, পথ তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। যদি আমরা পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করিতে পারি তবে সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য হিন্দুরাও আমাদের সহিত আসিয়া দাঁড়াইবে; না—আমাদের তখন, তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। আমরাও তখন ভারতের অন্যান্য হিন্দু ভাইদের ইচ্ছানুসারে সাহায্য করিতে পারিব। পৃথকরাষ্ট্র গঠন করিয়া আমরা সমস্ত ভারতের হিন্দুকে হিন্দুত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করিব।''

ডঃ মুখার্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন, —''কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যে, তাঁহারা সারা বাংলাকে যুক্ত ভারতের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই যদি ইংরাজের নিকট হইতে হিন্দুর পৃথক রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায়, তবে আমাদের আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই যেন আমরা অদ্য হইতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই এবং প্রস্তুত থাকি। পৃথক বাঙ্গালী হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে যদি আমাদের একলক্ষ হিন্দুকেও আত্মাহুতি দিতে হয় তবে হাসি মুখে আমরা যেন মৃত্যুবরণ করিতে কুণ্ঠিত না হই। আমি নিজেকে কখনও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বলিয়া বিবেচনা করি না— এক বিরাট পরিবারের একজন বলিয়াই আমি সর্বদা মনে করি। মাত্র তিনমাস পূর্বেও আমি এই বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী ছিলাম। কিন্তু আমি এখন কঠোরতম বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমার মতে politics is realism অর্থাৎ বাস্তবতাই রাজনীতি। আমাদের এখন বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের, উত্তরবঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে—যেন আবশ্যকবোধে পাকিস্তানী সরকারকে আমরা সর্বতোভাবে অচল করিয়া দিতে পারি। কোথায় থাকিবে তখন মিঃ সুরাবর্দী আর কোথায় থাকিবে মিঃ জিন্না। নিদ্রিত শক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিরোধ ও নিরসনকল্পে আমরা দীক্ষা গ্রহণ করিব।...

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট একথা মানিয়া লইয়াছে যে, দেশের অনিচ্ছুক অংশের উপর জোরপূর্বক কোনও শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। কাজে কাজেই মুসলমানগণ বাধা প্রদান করিতে কসুর করিবে না এবং গণপরিষদ বর্জন করিয়া সমস্ত বাংলার উপর সরাসরি পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করিবে। স্বতন্ত্র হিন্দুপ্রদেশ গঠনে যাঁহারা আপত্তি জানাইতেছেন তাঁহারা যে প্রকারান্তরে আত্মপ্রবঞ্চনাই করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সহিত তাঁহারা কি ঝুঝিতে পারিবেন? বর্তমানে আমাদের হয় পাকিস্থান নয় বঙ্গব্যবচ্ছেদ এই দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মুসলিম লীগ যদি আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া মানিয়া লয়, তাহা হইলে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন আমরা তুলিব না। কিন্তু এখনও পাকিস্তানই লীগের একমাত্র দাবী।

মিঃ জিন্না তাঁহার সর্বশেষ বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে পাকিস্তান আদায় করাই লিগের চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত, কাজেই হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্র সমগ্র বাংলায় কোনও প্রকারেই প্রতিষ্ঠিত সম্ভাবনা হইবার নাই। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার জনসাধারণের জীবনও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও ধ্যান ধারণার স্বাধীনতা ভুক্ত হইবে। হিন্দু বাংলায় যাহাতে পাকিস্তানী সরকার মুহূর্তের জন্যও হস্তক্ষেপ করিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে সমগ্র বাংলায় আমাদের যথোপযুক্ত সংগঠন কার্য চালাইতে হইবে। আমরা এরূপ একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করিতে চাই যে সরকার লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সমূহ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম। হিন্দু বাংলাকে পাকিস্তানী শাসনের আওতায় আনিবার কোনরূপ হীনজনোচিত চেষ্টাকে আমরা বরদাস্ত করিব না। হিন্দু বাংলায় এরূপ শাসন কার্যকরী হইতে আমরা কোনক্রমেই দিব না। এরূপ সরকারের সহিত আমরা সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করিব, সরকারকে খাজনা দিব না, কোন প্রকার আনুগত্যও স্বীকার করিব না। এবং যাহাতে এরূপ শাসন ব্যবস্থা পূর্ণাংশে হিন্দু জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বে আসে তজন্য আবশ্যক চেষ্টা করিতে ইতস্তত করিব না। বৃটিশ মন্ত্রিসভা স্পষ্টত ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তান দাবী অনুযায়ী বাংলার হিন্দু অঞ্চল এবং পাঞ্জাবের হিন্দু শিখ অঞ্চল কোনক্রমেই পাকিস্তানের আওতায় আসিতে স্বীকৃত হইবে না। বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে বর্তমানেও উক্ত ঘোষণা অবশ্যই সমর্থন করিতে হইবে।

কলকাতায় সাড়ম্বরে পালিত হলো শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবস

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) মিহির সাহা, অমিতাভ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সিংহ, দেবব্রত চৌধুরী, পবিত্র গুপ্ত ও কে কে গাঙ্গুলী।

বাসুদেব পাল।। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি পারমিট ছাড়াই কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। তাই আজ আমাদেরকে আর পারমিট নিয়ে যেতে হয় না। এটা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদান। তাঁর মৃত্যুর কারণ আজও অজ্ঞাত। রহস্যাবৃত। গত ২৩ জুন কলকাতার স্টুডেন্ট হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক সমিতি আয়োজিত 'শ্রদ্ধাজ্ঞাপন' অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে কে গাঙ্গুলি। তিনি আরও বলেন, বৃটিশদের চক্রান্ত ছিল সম্পূর্ণ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা। শ্যামাপ্রসাদ সেখান থেকে এই পশ্চিমবঙ্গকে শেষ পর্যন্ত বের করে আনেন। যদিও তিনি দেশভাগের বিরোধী ছিলেন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহারাজার কাছ থেকে লিজে নেওয়া ৩৬০০(৬০×৬০) কিমি এলাকায় বৃটিশ সৈন্য ছিল। ১৫ আগস্টের অনেক আগেই সেখানে পাকিস্তানী পতাকা উড়েছিল। তারপর হানাদারদের ছদ্মবেশে পাক-বাহিনীর আক্রমণের সময় রোজ রাত্রে ভারতীয় সেনাদের আগামী পরিকল্পনার কথা মাউন্টব্যাটেন জানিয়ে দিতেন পাক-সেনার সর্বাধিনায়ক বৃটিশ অফিসারকে টেলিফোনেই। আর যখন পাকিস্তান আর যুদ্ধ চালাতে পারছিল না তখনই মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রসঙ্ঘে যান। ভারতীয় সেনারা সেসময় সম্পূর্ণ কাশ্মীরকে পাক-দখলমুক্ত করতে পারত। ভুল পরামর্শেই তা হয়নি। শ্রীগাঙ্গুলি বলেন ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল ইংরেজ পার্লামেন্টে গৃহীত 'ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' এর ফলেই। শ্রীগাঙ্গুলি শ্রোতৃবর্গকে আশ্বস্ত করেন, ভারতীয় সেনারা বুকের রক্ত দিয়ে কাশ্মীরকে রক্ষা করেছে এবং করবে।

সভার অন্যতম বক্তা ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ বলেন, ''মাটি ও বেটি' যত নষ্টের মূলে। এক বিদেশীনীর (লেডি মাউন্টব্যাটেন) কারণেই আজ 'কাশ্মীর' নিয়ে যত মাথাব্যথা। অথচ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণ করার পরেই দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর দূরদর্শিতা। আর গান্ধীজীকে 'জাতির জনক' বলা হয়। তিনি দেশভাগের বিরোধী বলে বারংবার মুখে বললেও কাজের বেলায় কিছু করেননি। যে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের নিয়ে হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন বলে তিনি নাকি সেকুলার, আর হিন্দু প্রজারা হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে তারা সাম্প্রদায়িক!"

তিনি আরও বলেন--- ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতির মানুষ ছিলেন না। শিক্ষা জগতের মানুষ তিনি, ঘটনাচক্রে রাজনীতিতে জড়িয়ে যান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক— ইংরেজ রাজা বা রাণীর ছবি হটিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিরোধিতা করেছিল সুরাবর্দীর মতো মুসলমান নেতারা। তিনিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলমানরা সেই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল।

ডঃ সিংহ বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গরূপী যে বাস্তু শ্যামাপ্রসাদ বাংলার হিন্দুদের জন্য দিয়ে গেছেন তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার আহ্বান জানান শ্রী সিংহ। এদিন সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্যামলেশ দাস, দেবব্রত চৌধুরী, ডঃ পবিত্র গুপ্ত, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ।

সভা সঞ্চালন করেন মিহির সাহা এবং শেষে ধন্যবাদ জানান অজয় নন্দী।

শ্যামাপ্রসাদ চর্চা

লিখিত ও সম্পর্কিত

রাজরোষ আর সেকুলারবাদীদের ঘৃণ্য রাজনীতি শ্যামাপ্রসাদ চর্চায় সারস্বত সাধনার ধারাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ও তাঁর সম্পর্কিত বহু লেখনী সেই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরকম কিছু উল্লেখযোগ্য পুস্তকের তালিকা থাকল স্বস্তিকার এবারের শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যায়। এর বাইরে পাঠক নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে আরও বই পড়বেন। কিন্তু আমাদের বিচারে এই বইগুলো অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। —স: স্ব:

১. শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ	—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
২. শ্যামাপ্রসাদ	—বীরেশ মজুমদার
৩. রাষ্ট্রসংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর	—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৪. শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ	—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
৫. দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ	—শ্যামলেশ দাশ
৬. শ্যামাপ্রসাদ ব্যর্থ বলিদান	—শান্তনু সিংহ
৭. নোয়াখালির মাটি ও মানুষ	—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
৮. মৃত্যুঞ্জয়ী শ্যামাপ্রসাদ ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ	—অরুণ ভদ্র
৯. শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ	—অরুণ স্যানাল
১০. কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ	—রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়
১১. শ্যামাপ্রসাদ : জন্মশতবর্ষে	—নিখিলেশ গুহ
১২. শ্যামাপ্রসাদ কি সাম্প্রদায়িক?	—রমেন দাস
১৩. নোয়াখালীর ইতিকথা	—নলিনীরঞ্জন মিত্র
১৪. বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ	—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
১৫. বঙ্গ সংহার এবং	—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
১৬. বাংলা : ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু	—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
১৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস	—অমলেশ ত্রিপাঠী
১৮. আমার রাজনৈতিক জীবনের পঞ্চাশ বৎসর	—আবুল মনসুর আহমদ
১৯. শ্যামাপ্রসাদ	—কবিশেখর কালিদাস রায়
২০. স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি	—অমলেন্দু দে
২১. ভারত বিভাজন : যোগেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর	—বিপদভঞ্জন বিশ্বাস
২২. দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন পদত্যাগ করেছিলেন	—দেবজ্যোতি রায়
২৩. প্রসঙ্গ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	—ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ
২৪. Educational Speeches	–Dr. Syamaprasad Mookerjee
২৫. Leaves from a Diary	– " "
২৬. Dr. Syamaprasad Mookerjee	–Dr. Anil Chandra Banerjee
২৭. Dr. Syamaprasad Mookerjee : Correspondence, Speechese Reports	–Dr. Reena Bhaduri (Ed)
২৮. Dr. S.P. Mookerjee : Selected Speeches in Bengal Legislative Asmbly	– " "
২৯. Portrait of a Martyr	–Balraj Madhok
৩০. 1946 : The Great Calcutta Killings & Noakhali GENOCIDE	–Dr. Dinesh Ch. Singha & Ashok Dasgupta
৩১. স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা (১৯৫৪ সালের ২৩ জুন বা ৬ জুলাই থেকে প্রতি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অদ্যাবধি (৪.৭.২০১১) প্রকাশিত হয়ে আসছে।)	
৩২. শতবর্ষের আলোয় শ্যামাপ্রসাদ	—সঙ্কলন ও সম্পাদনা : ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতি

এবং হিন্দু মহাসভা পেপার্স, শ্যামাপ্রসাদ পেপার্স
এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য রচনা।

Swastika RNI No. 5257/57
4 July - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

দাম : ৫.০০ টাকা